প্রথম পরিচ্ছেদ

ভূমিকা ঃ কোচবিহারের সাধারণ রূপরেখা

কোচবিহার বলতে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উত্তরাঞ্চলের একটি জেলাকে বোঝায়। এই জেলার পাঁচটি মহকুমা - কোচবিহার সদর, তুফানগঞ্জ, দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা ও মেখলিগঞ্জ। ভারতভূক্তির পূর্বেও কোচবিহার এই পাঁচটি মহকুমায় বিভক্ত ছিল। এই জেলাটি ত্রিকোণাকৃতি এবং এর ভৌগোলিক অবস্থান হল ২৫° ৫৭′ ৪০″ উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২৬° ৩২′ ২০″ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮° ৪৭′ ৪০″ পূর্ব দ্রাঘিমা থেকে ৮৯° ৫৪′ ৩৫″ পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যবর্তী। বর্তমান কোচবিহার জেলার উত্তরে জলপাইগুড়ি জেলা, পূর্বে আসাম রাজ্য, দক্ষিণে বাংলাদেশ এবং পশ্চিমে জলপাইগুড়ি জেলা ও বাংলাদেশ, এই জেলার আয়তন ৩৩৮৬ বর্গ কিলোমিটার। এই জেলায় রয়েছে পাঁচটি মহকুমা, নটি থানা, ১২৮ টি গ্রাম পঞ্চায়েত, ১২ টি পঞ্চায়েত সমিতি। এই জেলার মোট জনসংখ্যা — ২৪,৭৮,২৮০ জন (২০০১ আদমসুমারী)। মহকুমা গুলোর আয়তন হল — সদর - ৭৩৭.৬ বঃ কিঃ মিঃ, তুফানগঞ্জ - ৫৮৫.৭ বঃ কিঃ মিঃ, দিনহাটা - ৭০৪.২ বঃ কিঃ মিঃ, মেখলিগঞ্জ - ৪৯৭.৬ বঃ কিঃ মিঃ, মাথাভাঙ্গা - ৬২৬.৮ বঃ কিঃ মিঃ।

সুপ্রাচীন কাল থেকেই কোচবিহারের ভৌগোলিক প্রাকৃতিক পরিবেশ ছিল পরিবর্তনশীল। নদী মাতৃক কৃষিপ্রধান এই জেলার মধ্য দিয়ে দক্ষিণবাহী স্রোতস্বিনী তিস্তা, তোর্ষা, জলঢাকা, কালজানি, রায়ডাক, গদাধর, সঙ্কোশ নদী প্রবাহিত। নদীগুলির বিশালতা, গভীরতা আজ আর পূর্বের অবস্থায় নেই। আবার কিছু নদী বর্তমানে বিলুপ্ত। কোচবিহারের রাজন্যবর্গ একদিন নদীপথেই কাশী পর্যন্ত যাতায়াত করতেন। সে সময় নদী পথই ছিল এই রাজ্যের প্রধান পরিবহণ মাধ্যম।

বিভিন্ন আদমসুমারী ও জাতিগত সংখ্যার বিচারে দেখা যায় উত্তরবঙ্গের জনগোষ্ঠীর একটি বৃহৎ অংশ রাজবংশী জনসমাজ। এ সম্পর্কে E. A. Gait - লিখেছেন - "In Jalpaiguri, Cooch Behar and Goal Para, the persons now known as Rajbansi are either pure koches who, though dark have distinctly Mongoloid Physiogimony, or else a mixed breed in which the Mongolid element usually preponderates."[১] তাই প্রকৃতির নিয়মেই রাজবংশী জন গোষ্ঠীর কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও সামাজিক রীতি- নীতি প্রাধান্য লাভ করেছে এখানে। একদা স্বাধীন স্বয়ংশাসিত রাজ্য এই কোচবিহার ছিল রাজন্য শাসিত একটি জনপদ। "অবিভক্ত বঙ্গে উত্তরবঙ্গ বলতে রাজশাহী জেলার আটটি মহকুমা বোঝাত। কোচ ও রাজবংশী সমাজকে কেন্দ্র ও ভিত্তি করে রঙপুর, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলার মধ্যে একটি বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ঐক্য গড়ে উঠেছিল। এই তিনটি জেলাই প্রান্ত উত্তরবঙ্গের জেলা।"[২]

পৌরাণিক মত অনুসারে প্রাচীন কামরূপের সীমা পূর্বে দিক্কর বাসিনী থেকে পশ্চিমে করতোয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। প্রসঙ্গত বলা যায় "সপ্তম শতকে য়ুয়ান - চোয়াং (হিউয়েন সাং) পুন্ড্রবর্ধন থেকে কামরূপে যাবার পথে এই করতোয়া নদী অতিক্রম করেছিলেন"[৩] দিক্করবাসিনী নদী অরুণাচলে, করতোয়া উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলায়। যোগিনী তন্ত্রে উল্লেখ আছে —

"নেপালস্য কাঞ্চনাদ্রি ব্রহ্মপুত্রস্য সঙ্গমং।।
করতোয়াং সমাশ্রিতা যাবদ্দিক্কর বাসিনী।
উত্তরাস্যাং কঞ্জগিরি! করতোয়াত্তু পশ্চিমে।
তীর্থ শ্রেষ্ঠা দিক্ষুনদী পূর্বস্যাং গিরিকন্যকে।।"[৪]

সেই হিসেবে বলা যায় প্রাচীন কোচবিহার রাজ্য তথা বর্তমান কোচবিহার জেলা এই ভূখন্ডের অন্তর্ভুক্ত। "প্রাচীন কামরূপ দেশের চারটি অংশ পূর্ব থেকে সৌমারপীঠ, কামপীঠ, রত্নপীঠ ও স্বর্ণ পীঠ। কোচবিহার জেলা ছিল সে সময় রত্নপীঠের অন্তর্গত।"[৫]

কোচবিহার রাজ্যের পত্তনের পূর্বে কোচবিহার কামরূপ রাজ্যের (প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর) অন্তর্ভুক্ত ছিল। "ক্ষেন্ বংশের রাজারাই কামরূপ থেকে রত্ন পীঠকে পৃথক করে কামতারাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। কামদা বা গোসানী দেবী ছিলেন তাদের কুল দেবী। তাই রাজ্যের নাম কামতা এবং রাজধানীর নাম হয় কামতাপুর।"[৬] এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন নীলধ্বজ এবং সর্বশেষ রাজা নীলাম্বর। কামতাপুরের রাজকীয় ঐশ্বর্যে ও বৈভবে প্রলোভিত হয়ে ১৪৯৮ খ্রীঃ হোসেন শাহ কামতাপুর আক্রমণ করেন। দীর্ঘ সংগ্রামের পর মহারাজ নীলাম্বরকে বন্দী করে রাজধানী কামতাপুর দখল করেন।

যে বিশাল জনপদ থেকে বর্তমান কোচবিহার জেলার জন্ম হয়েছে, সেই বিশাল জন পদের এবং এতদঞ্চলের প্রাচীন অধিবাসীদের ইতিহাস এক গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যের অধিকারী এবং জেলার প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত হতে গেলে কোচরাজবংশের বিবর্তনের ইতিহাসও জানা প্রয়োজন। প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী কোচবিহার নামক এই রাজ্যের স্থপতি ছিলেন মহারাজা বিশ্বসিংহ। তার পরবর্তী কালে সিংহাসনে বসেন ষোড়শ শতাব্দীর বিক্রমাদিত্য মহারাজা নরনারায়ণ। তাঁর প্রধান সেনাপতি অনুজ শুক্লধ্বজ (চিলারায়)। এর সুযোগ্য নেতৃত্বে বীর বিক্রমে একের পর এক রাজ্য জয় করে রাজ্যের সীমাকে প্রসারিত করতে থাকেন। এ সময়ই কোচহিার রাজসভাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল এক সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল ও সারস্বত সমাজ। যাঁদের মধ্যমণি ছিলেন উত্তর পূর্ব ভারতের ভক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ মহাপুরুষ শঙ্করদেব। উত্তপূর্ব ভারতে সেদিন বয়েছিল এক ভক্তিবাদের প্লাবন। পাশাপাশি রাজধর্মের স্বাভাবিক পরিণাম হিসেবে ক্ষমতা, ঐশ্বর্য ও শক্তির শীর্ষ বিন্দুতে পৌঁছেই সিংহাসনের অংশীদারীকে কেন্দ্র করে শুরু হয় অন্তর্দ্বন্দ্ব। রাজনীতির কুটিল আবর্তে অবক্ষয় শুরু হয় ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে। সে সময় সংগঠিত হয় মুঘল আক্রমণ এবং সিংহাসনের রাজনীতিতে ভুটানের সক্রিয় অংশ গ্রহণ কোচবিহারের স্বাধীনতাকে বিপন্ন করে তোলে সাময়িক ভাবে।

কোচবিহারের রাজাগণ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। কোচরাজবংশ প্রতিষ্ঠার উন্মেষ লগ্ন থেকেই ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, গৃহবিবাদ, অভ্যন্তরীণ কলহ, দুর্নীতিপরায়ণ স্বার্থান্বেষী পরামর্শদাতার কুচক্রী ভূমিকা ও প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গে বিবাদ বিসম্বাদ লেগেই ছিল। স্বাভাবিক ভাবেই আর্থ সামাজিক জনজীবনে এই রাজনৈতিক সংকটের প্রভাব হয়ে ওঠে গুরুত্বপূর্ণ।

কোচবিহারের দ্বিতীয় মহারাজা নরনারায়ণের পৃষ্ঠপোষকতায় তৎকালীন কোচরাজ্য কামতাপুরে মহাপুরুষীয় বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন শঙ্করদেব। পরবর্তীকালে তাঁর অনুগামী ছিলেন দামোদর দেব ও মাধব দেব। "এই সমস্ত ধর্ম প্রচারকগণের চেষ্টায় কামতাপুর তথা কোচবিহার রাজ্যের তথা উত্তরবঙ্গের অধিবাসীগণ বৈষ্ণব মতাবলম্বী হন। প্রতি হিন্দুগৃহে তুলসী স্থাপিত হয়। এই রাজ্যের অধিবাসীগণ হরিপূজা করেন।"[৭] অদ্বৈত পন্থী শঙ্করদেব প্রবর্তিত রাধাবিহীন কৃষ্ণ আজও পূজিত হন কোচবিহারের মদনমোহনবাড়ীতে এবং জেলার সবকটি মহকুমার স্টেট ঠাকুর বাড়ীতে। এটাও সত্য যে লোক সংস্কৃতিতে রাধা বর্জিত নন।

১৫১০ খ্রীঃ থেকে ১৭৭৩ খ্রীঃ পর্যন্ত কোচবিহার ছিল রাজন্য শাসিত এক স্বাধীন রাজ্য। ১৭৭৩ খ্রীঃ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর গর্ভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস এবং তৎকালীন মহারাজা ধৈর্যেন্দ্র নারায়ণের মধ্যে এক সন্ধি চুক্তির মাধ্যমে কোচবিহার পরিণত হয় এক সামন্ততান্ত্রিক করদ মিত্র রাজ্যে। কালের বিবর্তনে নানা বন্ধুর পথ অতিক্রম করে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ১৯৪৯ খ্রীঃ ১২ ই সেপ্টেম্বর মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ কোচবিহারকে তাঁর রাজ ঐতিহ্যের সত্তা থেকে সরিয়ে এনে গণতান্ত্রিক ভারত ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত করেন। ১৯৫০ সালের ১লা জানুয়ারী (গভর্নমেন্ট অব্ ইন্ডিয়া এ্যাক্ট - ১৯৩৫ এর ২৯ (ক) নং ধারা অনুযায়ী) কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম পূর্ণাঙ্গ জেলায় পরিণত হয় । সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব ভারতের ৪৪০ বছরের স্থায়ী একটি হিন্দু রাজত্বের অবসান ঘটে। শুধু ভৌগোলিক ও প্রশাসনিক পরিবর্তনই নয়, তৎকালীন রাজ্যটির নামও পরিবর্তিত হয়েছে একাধিকবার। "ষোড়শ শতকে বিশ্বসিংহ প্রতিষ্ঠিত রাজ্যটির নাম ছিল 'কামতা'। মহারাজা নরনারায়ণের সময় 'বিহার', 'বেহার', 'নিজবেহার' নামে অভিহিত হতে থাকে।"[৮]

খান চৌধুরী আমানতুল্লা রচিত 'কোচবিহারের ইতিহাস' গ্রন্থের প্রথম খন্ডে উল্লেখ আছে, র‍্যালফফিচ, ষ্টিফেন ক্যাসিলা প্রমুখ বিদেশী পর্যটকগণ তাদের ভ্রমণ বৃত্তান্তে এদেশের নাম 'কোচ' বলে উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও তাঁর মতে (১)

"কোচদের বিহার ক্ষেত্র বা বাসস্থান থেকে কোচবিহার নামের উৎপত্তি। (২) কোচ বধূপুর (শিব জায়া পার্বতী নাকি কোচ - জাতিয়া ছিলেন। মতান্তরে স্বয়ং শিব কোচ - জাতীয় ছিলেন বলে তার জায়া কোচ বধূ)। (৩) কোচদেশ ও তার রাজধানী বিহার থেকেও কোচবিহার নামের উৎপত্তি। (৪) মোগল আমলে সুবা বা বিহার থেকে কোচরাজ্য বা দেশ বিহারের পার্থক্য বোঝানোর জন্য কোচবিহার নাম।" [৯] পরবর্তীতে তৎকালীন কোচরাজ্যের ২০ তম মহারাজা তথা কোচবিহারের রূপকার মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের আমলে ১৩/৪/১৮৯৬ খ্রীঃ এই নাম বিভ্রাট দূর করার জন্য কোচবিহার স্টেট কাউন্সিলের নির্দেশে বর্তমান কোচবিহার নামের প্রচলন হয়।

১৭৮৩ সালে মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণের রাজত্ব কালে ক্যাপ্টেন স্যামুয়েল টার্নার তিব্বত যাত্রার পথে কোচবিহারের যে বর্ণনা দেন সেটি হল — "Highly improved and fertile country where luxuriant growth of trees, amongst which the most conspicuous were sooparee semmel and banian, intermined with clusters of the bamboo and the rich verdure of the field." [১০]

১৯৯১ - এর আদমসুমারী অনুযায়ী কোচবিহারের জন বিন্যাস

থানা	মোট জনসংখ্যা	অতপশিলী জাতি	তপশিলী জাতি	তপশিলী উপজাতি
হলদিবাড়ী	৮৮৭০৩ (১০০)	৩৫৫৭০ (৪০.১০)	৫২৭০১ (৫৯.৪১)	৪৩২ (০.৪৯)
মেখলিগঞ্জ	১১৯২২৪ (১০০)	৩১৯১৩ (২৬.৭৭)	৮৬০৭৬ (৭২.২০)	১২৩৫ (১.০৪)
ঘোকসা ডাঙ্গা	১৩৭৫৫৯ (১০০)	৪৪২৫১ (৩২.১৭)	৯০৯৫৫ (৬৬.১২)	২৩৫৩ (১.৭১)
মাথাভাঙ্গা	২১১০৩৫ (১০০)	৭১১৪৩ (৩৩.৭১)	১৩৯৭৬১ (৬৩.২৩)	১৩১ (০.০৬)
শীতলকুচি	১৫১৯৩৩ (১০০)	৬৪০৬৮ (৪২.১৭)	৮৭৮৫১ (৫৭.৮২)	১৪ (০.০০৯২)
কোচবিহার সদর	৫৭৫৯৫৯ (১০০)	৩২৯৬৪৯ (৫২.২৩)	২৪২৪০৯ (৪২.০৯)	৩৯০১ (০.৬৮)
তুফানগঞ্জ	৩৫৫২৬২ (১০০)	১৭৭৯২৯ (৫০.০৮)	১৭৩৭১২ (৪৮.৯০)	৩৬২১ (১.০২)
দিনহাটা	৪৪৫২৭১ (১০০)	২৫২৬৪০ (৫৬.৭৪)	১৯১০৫১ (৪২.৯১)	১৫৮০ (০.৩৫)
সিতাই	৮৬১৯৯ (১০০)	২৬৯৮৮ (৩১.৩১)	৫৯২০৩ (৬৮.৬৮)	৮ (০.০০৯২)
কোচবিহার জেলা	২১৭১১৪৫ (১০০)	১০৩৪১৫১ (৪৭.৬৩)	১১২৩৭১৯ (৫১.৭৬)	১৩২৭৫ (০.৬১)

(বন্ধনীতে প্রত্যেকটি থানার মোট জনসংখ্যার জাতি / উপজাতির সংখ্যা শতকরা হারে দেখান হয়েছে)
(সংগ্রহ - District census hand book - 1991, Part - XII B Series - 26, P - 200 - 201)
(২০০১ সালের আদমসুমারী অনুসারে জেলার বর্তমান লোকসংখ্যা - ২৪,৭৮,২৮০)

তাবাকৎ - ই - নাসিরী গ্রন্থের লেখক মিনহাজ এস সিরাজ এর মতে "দশম শতাব্দীর কামরূপ (আসাম ও কোচবিহার নিয়ে গঠিত) অধ্যুষিত ছিল কোচ, মেচ ও থারু উপজাতির লোক যাদের মঙ্গোলয়েড ভাষা ও সংস্কৃতির প্রভাব বিদায়ী তুর্কীদের উপরেও পড়েছিল। এছাড়াও কামরূপ রাজ্যে বিভিন্ন সময়ে আধিপত্য বিস্তার করেছিল দানব, কিরাত, অসুর, বর্মণ, চুটিয়া, পাল ও ক্ষেন রাজবংশ।" [১১]

নৃতাত্ত্বিক বিচারে এতদঞ্চলে তপশিলী জাতি বা উপজাতির পরিচয় যাই হোক না কেন, দীর্ঘ দিনের সাযুজ্য ও

সহাবস্থানের ফলে এসকল জনগোষ্ঠীর (Race) কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক, সামাজিক লোকাচার এবং ভাষা ব্যবহারে বাঙালী সংস্কৃতি ও ভাষার অনুসারী এবং হিন্দুধর্মে প্রভাবিত বলা যায়।

স্থানীয় প্রাচীন কৃষ্টি ও সংস্কৃতি রাজবংশী ক্ষত্রিয় জনসমাজের মৌল রসধারায় পুষ্ট। প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী লোকায়ত সংস্কৃতির ধারাটির সঙ্গে মিশ্রণ ঘটে পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত মানুষের নিজস্ব কৃষ্টি ও সংস্কৃতির। ফলস্বরূপ দেখা যায় জেলার বহু বিচিত্র লৌকিক দেবদেবী, লোকায়ত নৃত্য - গীত, পূজা - পার্বণ, সংস্কার - ব্রত, মেলা ইত্যাদি। লোকসঙ্গীত ভাওয়াইয়া গানে প্রতিফলিত হয় এতদঞ্চলের সহজ সরল জীবনের প্রতিচ্ছবি। স্বাধীনতার পর বিভিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত উন্নয়নের ফলে প্রতিরক্ষা, শাসনতান্ত্রিক ও ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও এক নতুন জোয়ার সৃষ্টি হয় এতদঞ্চলে। ফলে প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী সংহত কোচবিহারের জনগোষ্ঠীর কৃষ্টি ও সংহতি যা এতদিন এতদঞ্চলের জনজীবনে প্রবহমান ছিল, তার মধ্যে ছোঁয়া লাগে এক নূতন হাওয়া, যার প্রভাব সুদূর গ্রামাঞ্চলেও পৌঁছে যায়। কোচবিহারের লোকজীবনের ঐতিহ্যবাহী বহু প্রাচীন কৃষ্টি ও লোকায়ত সংস্কৃতির বিভিন্ন নিদর্শন আজ তাই অবহেলায় ম্রিয়মান। নূতন প্রজন্মের কাছে আজ আর প্রবাদ প্রবচন, ছড়া, ছিল্‌কা, লোকনাটক, লোক গীতি, লোকায়ত উৎসব অনুষ্ঠান সমান ভাবে গ্রহণ যোগ্য নয়। লোকসংস্কৃতিবিদ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য আক্ষেপ করে বলেছেন — "গ্রাম্য লৌকিক খেলাধূলা ছেলেমেয়েরা আর করে না, লোক সঙ্গীত কদাচিৎ শুনতে পাওয়া যায়, লোককথা আর কেউ বলে না।" [১২] আজ একবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে যুবক যুবতিগণ জানে না লৌকিক খেলাধূলা কি ? ঐতিহ্যের প্রতি এমন অবক্ষয়িত মনোভাব যেমন চোখে পড়ে তেমনি কোচবিহারের লোক সংস্কৃতির বহু নিদর্শন আজ আর দর্শক মনে এবং সামাজিক পরিবেশে তেমন করে দাগ কাটতে পারে না। কালের বিবর্তনে সংস্কৃতির এরূপ সংকটের ছায়া থাকলেও আজও প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত কিছু মানুষ কোচবিহারের লোক সংস্কৃতির বর্ণময় বিভিন্ন ধারাকে সজীব, সচল ও প্রবহমান রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও আবহমান কাল ধরে বসবাসকারী জনজাতিগণের উন্নত সংস্কৃতির মূলেও রয়েছে ভ্রাতৃত্ববোধ ও ঐক্যভাবনা। এই নিয়েই বর্তমান কোচবিহার।

তথ্য সূত্র ঃ

১। History of Assam - E.A.Gait, P - 48,1933

২। প্রান্ত উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত — ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক, পৃ - ১ (১৯৭৭)

৩। বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব) — নীহার রঞ্জন রায়, পৃ- ৪৭ (১৩৭৩)

৪। যোগিনী তন্ত্রম্ — স্বামীসর্ব্বেশ্বরানন্দ সরস্বতী, একাদশঃ পটল, পৃ- ১১৪ (১৩৮৫)

৫। কোচবিহারের ইতিহাস — খান চৌধুরী আমানতুল্লা,পৃ- ৭ (১৯৩৬)

৬। কোচবিহার পরিক্রমা — কোচবিহার গ্রন্থ প্রকাশন প্রস্তুত কমিটি, পৃ- ২৪ (১৯৮৪)

৭। কোচবিহারের ইতিহাস — হেমন্ত কুমার রায়বর্মণ, পৃ- ২৭ (১৯৭৭)

৮। সাহিত্যসাধনায় রাজন্য শাসিত কোচবিহার — ডঃ শচীন্দ্র নাথ রায়, পৃ- ৮,৯ (১৪০৬)

৯। কোচবিহারের ইতিহাস — খান চৌধুরী আমানতুল্লা, পৃ- ৪ (১৯৩৬)

১০। An Account of an Embassy to this court of the Teshoolama in tilect - পৃ - ৩৯
(মধুপর্ণী, কোচবিহার জেলা সংখ্যা) কোচবিহার সম্পর্কিত কিছু ঐতিহাসিক তথ্য; একটি সমীক্ষা — পরিতোষ দত্ত।

১১। Kirat janakrit - Dr. Suniti Kr. Chatterjee, P - 101, reprint (1998)

১২। বাংলার লোকসংস্কৃতি — ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য,পৃ - ১৪ (১৯৮২)